নাগরিকপঞ্জিতে প্রকৃত নাগারিকদের নাম যেন বাদ না যায়

অসমে নাগরিকপঞ্জিতে প্রকৃত নাগরিকদের নাম যাতে বাদ না যায় তা দেখা উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। সোমবার গুয়াহাটিতে নাগরিকপঞ্জির শেষ খসড়া রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে ৪০ লক্ষ বাঙালির নাম বাদ গেছে। এটা কেন হল তা দেখতে হবে। এই নাগারিকপঞ্জি তৈরি হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে। অসমে-এর প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কয়েক দশক ধরে যেসব বাঙালি বা বিহারি কিংবা অন্যরাজ্যের মানুষ অসমে রয়েছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন তাদের নাম বাদ গেলে তা অবশ্যই তবে এনিয়ে অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি ও ব্যবস্থা রয়েছে বলেই জানিয়েছেন রেজিস্ট্রার জেনারেল অব ইন্ডিয়া। তাই প্রকৃত নাগরিকদের যাতে হয়রানি হতে না হয় এবং নাম বাদ না যায় তা দেখা জরুরি। কিন্তু পাশাপাশি রাজনীতির নামে প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা বিদেশিরা যেন রাতারাতি অসমে মাথা গলাতে না পারে। কারণ এধরনের মানুষরাই অসমে সমস্যা সৃষ্টি করে। একই সঙ্গে অসমে এ নিয়ে যাতে উত্তেজনা না ছড়ায় তা দেখা কর্তব্য অসম প্রশাসনের। অসমে লক্ষ লক্ষ বাঙালি সপরিবারে রয়েছেন দীর্ঘদিন ধরে। তারা ভারতের নাগরিক। কিন্তু অসমে মাঝেমধ্যেই বাঙালি,বিহারি, অসমিয়া আওয়াজ তুলে উস্কানি দেওয়া হয়। জাতি দাঙ্গাও হয়। এর আগে অসমে নেলি ম্যাসাকার'-এর মতো দুভার্গ্যজনক ঘটনা ঘটেছিল। সেই কথা বিস্মৃত না হই। নাগরিকপঞ্জি খসড়া রিপোর্টে যে সব প্রকৃত নাগারিকদের নাম বাদ গেছে, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখুক কেন্দ্রীয় সরকার। এনিয়ে সংসদে আলোচনা হওয়া দরকার।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুরের--শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসা, এর নাম মায়া। সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়–ভক্তি থেকে হয়। তাবে স্বামী বিবেকানন্দ অত স্বদেশের জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন?

দেশের লোকের কিরূপে দারিদ্র-দুঃখ বিমোচন হয়, তাহাদের কিসে সৎশিক্ষা হয়, কিসে তাহাদের ধর্মসঞ্চার হয়, এইজন্য স্বামীজী সর্বদা ভাবিতেন। কিন্তু তিনি দেশের লোকেরা জন্য যেরূপ দুঃখিত ছিলেন, আফ্রিকাবাসী নিগ্রোর জন্যও সেইরূপ দুঃখিত থাকিতেন। নিগ্রোকেও যেমন ভালবাসা, স্বদেশবাসীকেও সেইরূপ ভালবাসা, তবে তাহাদের সঙ্গে সর্বদাই থাকা, তাই তাহাদের সেবা আগে। ইহারই নাম কর্মযোগ। সকলেই কর্ম করে, কিন্তু কর্মযোগ বড় কঠিন। সব ত্যাগ ক'রে অনেক দিন ধরিয়া নির্জনে ভগবানের ধ্যান চিন্তা না করিলে এরূপ স্বদেশের উপকার করা যায় না, 'আমার দেশ' বলিয়া নয়, তাহা হইলে ত মায়া হইল; 'তোমার (ঈশ্বরের) এরা' তাই এদের সেবা করিব। তোমার আদেশ, তাই দেশের সেবা করিব; 'তোমারই এ কাজ' আমি তোমার দাস তাই এই-ব্রত পালন করিতেছি, সিদ্ধি হউক, অসিদ্ধি হইক; সে তুমি জান, আমার নামের জন্য নয়। এতে তোমার মহিমা প্রকাশ হইবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'অদ্বিতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া যেখানে ইচ্ছা যাও', স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন।

দিনপঞ্জিকা

১৫ শ্রাবণ, ভাঃ ১০ শ্রাবণ, **১ আগষ্ট,** ১৫ শাওন, সংবৎ ৪ শ্রাবণ বদি, ১৮ জেল্কদ্। সূর্য্যোদিয় ঘ ৫।১০, সূর্য্যাস্তি ঘ ৬।১৭। **বুধবার,** চতুর্থীপদ দিবা ঘ ৭।১২ মিঃ। পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ঘ ৯।২৯ মিঃ। অতিগন্ডযোগ দিবা ঘ ১।৪৯ মিঃ। বালবকরণ, দিবা ঘ ৭।১২ গতে কৌলবকরণ, রাত্রি ঘ ৭।৩০ গতে তৈতিলকরণ। **জন্মে**–মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ঘ ৯।২৯ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। **মৃতে**–দ্বিপাদদোষ, দিবা ঘ ৯।২৯ গতে দোষ নাই। **যোগিনী**– নৈঋর্তে, দিবা ঘ ৭।১২ গতে দক্ষিণে। **কালবেলাদি**–ঘ ৮।২৭ গতে ১০।৫ মধ্যে ও ১১।৪৪ গতে ১।২২ মধ্যে। **কালরাত্রি**–ঘ ২।২৭ গতে ৩।৪৯ মধ্যে। **যাত্রা**–নাই, দিবা ঘ ৭।১২ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ঘ ৯।২৯ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**-- দিবা ঘ ৭।১২ গতে দীক্ষা বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন গোবিক্রয়াদি, দিবা ঘ ৭।১২ গতে ৮।২৭ মধ্যে নৌকাযাত্রা ধান্যরোপণ কুমারীনাসিকাবেধ, দিবা ঘ ১০।৫ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যুঢ়ান্ন নামকরণ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ পূণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন, বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানরম্ভ **বিবাহ–সন্ধ্যা ঘ ৬।১৭ গতে রাত্রি ঘ ৮।৪৬ মধ্যে মকর ও কুম্ভ লগ্নে পুনঃ রাত্রি ঘ ১০।১৭ গতে ২।২৭ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ঘ ৩।৪৯ গতে শেষরাত্রি ঘ ৫।১১ মধ্যে মেষ বৃষ মিথুন ও কর্কট লগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ**– পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ঘ ৭।১২ গতে **নাগপঞ্চমী। শ্রীশ্রীমনসাদেবী ও অষ্টনাগ পূজা। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের স্মরনোৎসব** (১লা আগষ্ট, ১৯২০ খ্রীঃ)। **বিশ্ব স্তন্যপান সপ্তাহ** (১লা হইতে ৭ আগষ্ট)। **অমৃতযোগ**–দিবা ঘ ৬।৫৯ মধ্যে ও ৯।৩২ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৫।১৪ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৫০ গতে ৯।৪ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৫।১১ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**– দিবা ঘ ১।৪৯ গতে ৩।৩২ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৯।৪ গতে ১০।৩৪ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৫ শ্রাবণ,ভাঃ ১০ শ্রাবণ, ১ আগষ্ট, ১৮ জিল্কদ, ১৫ শাওন, উঃ ৫।০৯, অঃ ৬।১৬, বুধবার, চতুর্থী দি ঘ ৭।১১, সেহ্‌রী শেষ ৩।৪০ ইফ্‌তার ৬।২২।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

ব্রিটিশ বিরোধী গান্ধীবাদী আন্দোলনে বাঁকুড়া

ডঃ প্রসেনজিৎ সরকার

শেষ পর্ব

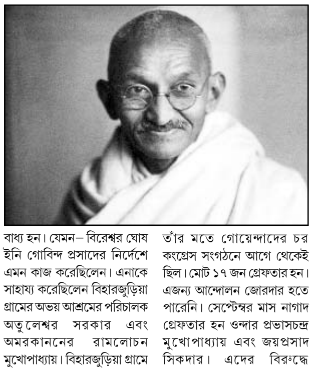

তাঁরা নানাভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের সাহায্য দিয়েছেন, সমর্থন করেছেন। এসময় প্রায় শতাধিক মহিলার নাম পাওয়া যায়, যাঁরা কারাবরণ করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইন্দাসের সিন্ধুবালাদেবী। ইনি আন্দোলন চলাকালীন সন্তানসম্ভবা ছিলেন। আন্দোলনের সময় ইনি বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সহ তিনজনকে আশ্রয় দেন নিজগৃহে। সেই অপরাধে তাঁর হাজতবাস হয় এবং এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য, তাঁকে হাজত পর্যন্ত (ইন্দাস বিডিআর রেলস্টেশন থেকে হাজত) হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সোনামুখীর সত্যবালাদেবী আন্দোলন করার দায়ে বরহমপুর জেলে বন্দি ছিলেন। ইনি পুরুষের বেশ ধরে কাঁথি সত্যগ্রহীদের দলে ছিলেন। পাত্রসায়রের এক জনসভায় পুলিশকে সুষমারানী পালিত ও শৈলবালা দে নামক দুই নির্ভীক বিপ্লবীর মুখে 'শেম শেম' ধ্বনি শুনতে হয়েছিল। কালিঞ্জরতলার এক সভায় চৌকিদারদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছিলেন বিন্দুবাসিনী দেবী ও তিনকড়ি দেবী। এইভাবে নানা ঘটনার মাধ্যমে সফলভাবে বাঁকুড়া জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষীয় প্রেক্ষাপটে গান্ধীজি যখন আন্দোলন প্রত্যাহার করে ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের পর হরিজন উন্নয়নে নিজেকে নিয়োগ করেন তখন বাঁকুড়া জেলাতেও তার কিছু প্রভাব দেখা যায় ও আন্দোলন কিছুটা শ্লথ হয়ে পড়ে। খ্রিষ্টাব্দের পর জেলায় তেমন আন্দোলন আর হচ্ছিল না। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে গান্ধীবাদী নেতাদের সাথে জেলার ছাত্র যুবনেতাদের মতপার্থক্য দেখা যায়। গান্ধীজির মস্তিষ্ক প্রসূত ১৯৪০খ্রিষ্টাব্দের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ জেলায় তেমন সাড়া জাগাতে পারে নি। এরকম পরিস্থিতিতে ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন গান্ধীজি শুরু করেন। পরিস্থিতি আবার পাল্টে যায় যদিও আগের দুই আন্দোলনের তীব্রতা এই আন্দোলনে জেলায় ততটা দেখা যায়নি।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন ঃ ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু করেন গান্ধীজি ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে। ৮ আগষ্ট এই আন্দোলনের ঘোষণার পরেই ৯ আগস্ট গান্ধীজি সহ অনেক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। তারপরই সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। বাঁকুড়া জেলাতেও এই আন্দোলনের আঁচ এসে পড়ে। তবে এই আন্দোলন সম্পর্কে কোনও পূর্ব পরিকল্পনা জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের ছিল না, ছিল না কোন প্রকার সাংগঠনিক প্রস্তুতি। সুতরাং কিছুটা হলেও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর এই আন্দোলন নির্ভর করেছিল। আন্দোলন চলাকালীন এ জেংলারও উল্লেখযোগ্য নেতারা গ্রেফতার হন, যেমন--- কানাইলাল দে, সুশীল পালিত, কমলকৃষ্ণ রায় প্রমুখ। এসময়কার জেলার কমিউনিষ্ট নেতারা যেমন ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ইন্দু সাঁই, নন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ পালিত এঁরা সবাই আন্দোলনে যোগদান করেন এবং কারাবরণ করেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে এদের অনেকেই রাজনীতি ছেড়ে দেন। পুলিশ পরবর্তীতে গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ এবং রামকৃষ্ণ দাসকেও গ্রেফতার করেছিল।

এই আন্দোলনে বাঁকুড়ার ছাত্রযুবরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাস্তায় নেমে তাঁদের আন্দোলন করতে দেখা গিয়েছিল। আন্দোলনে কয়েকজন নেতা লুকিয়ে থেকে নেতৃত্ব দিতে বাধ্য হন। যেমন– বিরেশ্বর ঘোষ ইনি গোবিন্দ প্রসাদের নির্দেশে এমন কাজ করেছিলেন। এনাকে সাহায্য করেছিলেন বিহারজুড়িয়া গ্রামের অভয় আশ্রমের পরিচালক অতুলেশ্বর সরকার এবং অমরকাননের রামলোচন মুখোপাধ্যায়। বিহারজুড়িয়া গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন বীরেশ্বর ঘোষ এবং মূলত বিহারজুড়িয়া থেকেই আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকে। এই সময়কালে তাদের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় গ্রামবাসীদেরও আন্দোলনে সামিল করা, এই উদ্দেশ্যে তাঁরা গোপনে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে থাকেন এবং খাদ্য আন্দোলন শুরু করেন। এতে সরকারি উদ্বৃত্ত খাদ্য আটক করে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। এই আন্দোলন বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

এই জেলার আন্দোলন সম্পর্কে অবশ্য কিছুটা ভিন্ন তথ্য দেন রামকৃষ্ণ দাস। তাঁর লেখনী অনুযায়ী আন্দোলন চলাকালীন কংগ্রেস কর্মীদের জেলার বিভিন্ন অংশ রাত্রে আত্মগোপন করে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ভোর হবার আগেই নিজ কার্যক্ষেত্রে চলে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, কর্মীদের যেখানে আত্মগোপন করে থাকার কথা সেখানে ভোর হবার আগেই পুলিশ উপস্থিত হয় তাদের গ্রেফতরি পরোয়ানা নিয়ে। তাঁর মতে গোয়েন্দাদের চর কংগ্রেস সংগঠনে আগে থেকেই ছিল। মোট ১৭ জন গ্রেফতার হন। এজন্য আন্দোলন জোরদার হতে পারেনি। সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ গ্রেফতার হন ওন্দার প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং জয়প্রসাদ সিকদার। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল --- এঁরা ওয়েসলিয়ান কলেজে (অধুনা খ্রিষ্টান কলেজে) জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। গঙ্গাজলঘাটি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে একইভাবে কংগ্রেস পতাকা উত্তোলনের দায়ে গ্রেফতার হন বিহারজুড়িয়ার গোবর্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবর্ধন রায় এবং বটকৃষ্ণ রায়।

তৎকালীন গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ীও বেশ কিছু তথ্য এই আন্দোলন সম্পর্কে পাওয়া যায়। আন্দোলন শুরু হবার কিছুদিন পর আগস্টের মাঝামাঝি জনৈক মোহনলাল গোয়েঙ্কা বাঁকুড়ার ফঃবঃ নেতা রামকৃষ্ণ দাস ও ছাত্র নেতা ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করে তাঁদের আন্দোলন শুরু করতে বলেন। যাবতীয় অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি তিনি দেন। সেপ্টেম্বর ১ তারিখে গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ বাঁকুড়া শহরে শোভাযাত্রায় অংশ নেন। এরপর তিনি গ্রেফতার হন এবং বিরেশ্বর ঘোষকে দায়িত্ব দেন। তাহলে এখান থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় রামকৃষ্ণ দাস যে গ্রেফতারির কথা বলেন তা কিন্তু সত্য নয়।

এসময় বেশ কিছু নাশকতামূলক কাজ বিদ্রোহীর দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল, কিন্তু এগুলি সরকারি প্রশাসনকে খুব বড়ো ধাক্কা দিতে পারেনি। সেপ্টেম্বর মাসে বিক্ষিপ্ত বেশ কিছু এরকম ঘটনা ঘটে যেমন বেতুড় গ্রামে ডাকঘরে অগ্নি সংযোগের ব্যর্থ চেষ্টা, বাঁকুড়া ও ভেদুয়াশোলের মধ্যবর্তী স্থানে রেললাইন উপড়ে ফেলার এবং রেলগাড়িকে লাইনচ্যুত করার কার্যকলাপ, ছাতনায় নিকটবর্তী টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া, বাঁকুড়ার ডাকঘরে আগুন লাগানো, বিভিন্ন জায়গায় মদের দোকান জ্বালানো। অক্টোবর মাসে কেঞ্জাকুড়ার ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে আগুন লাগানো হয়েছিল। বেশ কিছু জায়াগায় জাতীয় পতাকা তোলা হয় যেমন মুন্সেফ আদালত ভবনে। ডিসেম্বর মাসে শহরের নিকট কেশিয়াকোলের পুলিশ নজরদারি চৌকি ধ্বংস করা হয়। পুলিশ নজরদারি চৌকি ধ্বংস করা হয়। ইন্দাসেও ডাকঘর পোড়ানো হয়েছিল।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, ছাত্ররা এ আন্দোলনে বড় ভূমিকা নেয়। গোবিন্দপ্রসাদের গ্রেফতারির প্রতিবাদে অমরকাননের ছাত্ররা ধর্মঘট করে। আন্দোলনের সমর্থনে ধর্মঘট করে তিলুড়ি স্কুল ও বিষ্ণুপুরের স্কুলেরছাত্ররা। এইভাবে জেলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে আন্দোলনের সমর্থনে নানান ঘটনা ঘটলেও তা কখনোই সর্বাত্মক রূপ নেয়নি। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার দুর্ভিক্ষ হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি সেবায় লেগে পড়ে। আন্দোলনের গুরুত্ব হ্রাস পায়। আগস্ট আন্দোলনের বান্দিরাও ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ছাড়া পান। এইভাবেই গান্ধীবাদী আন্দোলনকে আঁকড়ে ধরেছিল পিছিয়ে পড়া একটি জেলা তথা বাঁকুড়ার মানুষ। তাঁদের কীর্তিকাহিনী আজ প্রমাণিত। নির্ভিক সৎ এসব মানুষরা আমাদের কাছে নমস্য। আন্দোলনে অংশ নেওয়া এসব মানুষদের ঘটনা আরও ভালোভাবে খুঁজে বের করার জন্য আরও বেশি করে গবেষণার প্রয়োজন।

নাগপঞ্চমী

কাঞ্চন বসু

শ্রাবণ মাস এলে চাষিদের মুখে হাসি ফোটে, কবিদেরও! কিন্তু এই সময় সাপেরা তাদের বানভাসি ঘরবাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসে, মানুষ তাদের ভয় পায় তাই পুজো করে। সেই কারণেই শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীকে 'নাগপঞ্চমী' হিসাবে পালন করা হয়। সাপকে আমরা ভয় পাই, কিন্তু এই প্রাণীটির কাহিনীতে শত শত, হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় মনের বিবর্তনের কথা ধরা আছে।

জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের কাহিনীতে সাপ সম্পর্কে পশ্চিমী-আর্য মনের বিরূপতার পরিচয় আছে। কিন্তু এই একই প্রাণী কালক্রমে 'নাগরাজ' এবং 'মনসা' রূপে পূজিত হন। এই দুজন কিন্তু একই ব্যক্তি নন। প্রথমজন পুরুষ ও দ্বিতীয় জন নারী। এতে অবশ্য দোষের কিছু নাই, কারণ সাপের স্ত্রী-পুরুষ বিচারের জন্য বেশি কাছে যাওয়া নিরাপদ নয়, এমনকী পুজো করার সময়েও। প্রাচ্যে পৃথিবীর ধান-ই প্রধান শস্য। জমিতে প্রচুর জল না থাকলে ধান চাষ হয় না, আর জল থাকা মানেই সাপ থাকা। কিন্তু সাধারণত জলের সাপ বিষধর নয়, তাদের বিরক্ত বা আঘাত না করলে তারা কামড়ায়ও না। সাপের কাহিনীগুলিতে উচ্চবর্গের সংস্কৃতির সঙ্গে লোককৃষ্টির একটা টানাপোড়েন আছে। বাংলার আদি লোক কথায় 'মনসা ছিলেন, তিনি পরে 'পদ্মাবতী'-তে পরিণত হলেন, পদ্মপাতায় শিবের বীর্যপাতের ফলে তাঁর জন্ম। উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে পিতৃতন্ত্রের প্রবল্য, সেই তুলনায় পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতে মাতৃশক্তির প্রাধান্য, এটাও সাপের কাহিনীতে প্রতিফলিত। মহাভারতে বিনতার পুত্র গরুড়ের সঙ্গে তাঁর সৎমা কদ্রুর সর্প-সন্তানদের সংঘর্ষের বিবরণ আছে। আদিপর্বে এবং অন্যত্র সাপকে অশুভ বা রহস্যময় শক্তি হিসাবে দেখানো হয়। পরবর্তীতে 'যজুর্বেদ' এবং 'অথর্ববেদ'-এর সাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মন্ত্রপাঠের বিধি আছে, পরে 'গৃহ্যসূত্র'-এও সাপকে সম্মান জানানোর জন্য বার্ষিক আচারের বিধান দেওয়া হয়। আর্যদের ভাষায় 'নাগ' শব্দটিও দ্ব্যর্থবোধক; একদিকে 'নাগ' মানে 'সাপ' অন্যদিকে আর্য-বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধী আদিবাসীদেরও 'নাগ' বলা হত, আর্যরা তাঁদের 'উভচর' বলে গণ্য করতেন, কারণ তাঁরা স্থলে এবং জলে বসবাসে সমান অভ্যস্থ। যমুনার পূর্ববর্তী ভূখন্ডের জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নিতে বৈদিক এবং উত্তর-বৈদিক সভ্যতার অনেকটা সময় লেগেছিল, এবং গাঙ্গেয় অববাহিকার জলজঙ্গলে বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর সঙ্গে সঙ্গে সাপখোপের প্রাচুর্য তার একটা কারণ।

আর্যপুত্ররা অনেক সময়েই নাগ পুরুষদের দক্ষতা এবং নাগ মেয়েদের মোহিনী মায়ার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না। মহাভারতে অর্জুন ব্যাপারটা সামলে নিয়ে নাগ রাজকন্যা 'উলুপী'কে বিয়ে করেছিলেন বটে। কিন্তু তাঁর পৌত্র পরীক্ষিৎকে সাপের কামড়ে প্রাণ হারাতে হয়। পীরক্ষিতের ছেলে 'জন্মেজয়' সর্পযজ্ঞ করে সমস্ত সাপকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু 'সর্পরাজ বাসুকি'-র ভাইপো 'আস্তিক' সেই লক্ষ্য পূরণে বাধ হয়ে দাঁড়ান। এই পুরাণকথাগুলি গাঙ্গেয় অববাহিকার বিরাট সভ্যতার সঙ্গে আর্যদের তীব্র টানাপোড়েনের পরিচয় বহন করে।

বৈদিক সংস্কৃতিতে 'বরুণ'–কে পাতালবাসী নাগদের রাজা হিসাবে দেখানো হয়েছিল। দুই সভ্যতার বোঝাপড়ার প্রথম প্রমাণ দেখা যায় খ্রীষ্টজন্মের অন্তত তিনি শতাব্দী আগে– 'বুদ্ধ' এবং 'জৈন তীর্থঙ্কর'-দের মাথার ওপর পঞ্চনাগের ছাতা ধরে থাকার ছবিতে। প্রাচীনতর সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষও সাপের দেখা মেলে বটে, কিন্তু গাঙ্গেয় উপত্যকার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। কালক্রমে বৈদিক বিষ্ণুর মূর্তিকল্পনায় দেখা গেল, তিনি বিপুল 'শেষনাগ'-এর কোলে অনন্তশয়নে শায়িত, সেই মহাসর্প ফণা তুলে তাঁর মাথাতেও ছাতা ধরে আছেন। শিবের প্রবেশ আরও নাটকীয়– তাঁর কন্ঠলগ্ন 'বাসুকি' প্রবলভাবে ফোঁস ফোঁস করছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একদিন যে নাগেরা ছিল ভয়ঙ্কর, তারা কীভাবে ক্রমশ বৈদিক (বিষ্ণু) এবং অবৈদিক (শিব) দেবতাদের দেখাশোনার দায়িত্ব অর্জন করল। পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন বিশ্বাসকে মিলিয়ে দেওয়ার যে আশ্চর্য ক্ষমতা ভারতীয় সভ্যতার চরিত্রে নিহিত, এটা তারই একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত।

বৌদ্ধ সংস্কৃতি ভারত থেকে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্য নানা দেশে সাপের আরাধনার যে সব ধারা ছিল, এই সংস্কৃতি সেগুলি আত্মসাৎ করে নেয়। বৌদ্ধ ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ নাগ হল 'মুচলিন্দা' এবং তিববতি নাগ জলাশয় এবং অন্যান্য সম্পদের রক্ষাকর্তা হিসাবে পূজিত। খ্রিষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দী থেকে চিনের রাজারা ড্রাগনকে পুজো করতেন, অর্ধেক কুমির এবং অর্ধেক সাপ রূপে, তবে তার কিছু কিছু বৈশিষ্টও ছিল। প্রথম চিনা সম্রাট হুয়াংতি সাপকে তাঁর প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। 'হং' ড্রাগন হল এক রামধনু–সদৃশ সাপ, আর 'বাশে' ড্রাগন আবার এক অতিকায় অজগর, জাপানে পবিত্র 'ইয়ামাতা-নো-ওরোচি' ড্রাগন আসলে এক বিরাট সাপ, তার আটটা মাথা এবং আটটা লেজ। 'আমাতেরাসু–কামি' নামক শিন্তো দেবতাও তা-ই। কোরিয়াতেও অনুরূপ ঐতিহ্য প্রচলিত, বিশাল আকৃতির সাপ এবং অন্য সরীসৃপরা সেখানে ড্রাগন হিসাবে আরাধ্য। ভিয়েতনামে ড্রাগনের কল্পনায় আবার সাপ, কুমির এবং গিরগিটির সঙ্গে পাখিও মিশেছে।

খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্যে সেন্টা জর্জের ড্রাগন বধের ছবিতে এর ঠিক বিপরীত ধারণা দেখতে পাই। তবে সোসাইটিক ধর্মগুলিতে সাপকে শয়তান হিসাবে দেখানোর আগে প্রাচীন ইউরোপ, পারস্য, পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকাতেও সাপের আরাধনা প্রচলিত ছিল। অনেক দূরের প্রাচীন মেক্সিকোয় আজটেকরা 'কেৎসলকুতেল'-এর আরাধনা করত, সে হল পাখনাওয়ালা সাপ।

ভারতে আবার ফিরে আসা যাক, দক্ষিণ ভারতে নাগপঞ্চমীতে বোনেরা ভাইদের রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করে, আর উত্তর ভারতে এই অনুষ্ঠানটা হয় দশদিন পরে, 'রক্ষাবন্ধন' অনুষ্ঠানে। কেরলের যুদ্ধে পারঙ্গম নায়ারদের সর্প-ভজনার একটা সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে। মালায়ালিদের একটা বড় অংশ বছরের এই সময়টায় 'সর্প-কভু' নামে পরিচিত অঞ্চলগুলিকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা জানায়, দক্ষিণ ভারতের অনেক প্রাচীন মন্দিরে পুরোহিত এবং উপাসকরা এখনও 'শঙ্খচূড়' (King Cobra) বা 'গোখরো' সাপকে খাবার দেন, আবার সর্পদোষ অর্থাৎ সাপের অভিশাপ কাটানোর জন্য ব্রাহ্মণ্য আচারের পাশাপাশি লৌকিক ঝাড়ফুঁকও প্রয়োগ করা হয়। এক শতাব্দী আগে নীলগিরির কাছে মান্নারঘাটে এডগার থার্স্টন এমনকী সাপ-মসজিদের কথা লিখেছিলেন। মোটামুটি সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ভারত সাপের সঙ্গে বেশ মসৃণ ভাবেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। সেই ঐতিহ্যের কথা ভাবতে গেলে বাসুকির কাহিনী মনে পড়বেই। সমুদ্রমন্থন নিয়ে দেবাসুরের সংগ্রামে তাঁর শরীরটিকেই ব্যবহার করা হয়েছিল। দুই মহাশক্তির এই সংঘাতে বাসুকি ক্ষতবিক্ষত হন। দেবাসুরের মধ্যে এক সময় সন্ধি হয়। 'বাসুকি' আরোগ্য হয়েছেন কি না আমরা তা জানি না।

সম্পাদক সমীপেষু

গুহাবন্দি ফুটবল একাপোল চান্থায়োং-এর প্রতি খোলা চিঠি

প্রিয়
একাপোল,

বয়সের দাবি থেকে তুমি সম্বেধন করছি। আশা করি ভালো আছো। তুমি ও তোমার 'ওয়াইল্ড বোরস'-এর আশ্চর্যভাবে থাম লুয়াং গুহা থেকে মহাকাব্যিক বেঁচে ফিরে আসার ঘটনা মানুষের মুখে মুখে। তোমার স্বল্প পঁচিশ বছরের জীবনও কম আশ্চর্যের নয়। মাত্র দশ বছর বয়সে বাবা-মাকে হারিয়ে বুদ্ধ মন্দিরে পুরোদস্তুর কঠোর সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করতে হয় তোমাকে। ঠাকুরমা অসুস্থ থাকার কারণে সন্ন্যাস জীবনকে ত্যাগ করে ফিরে এলে বাড়িতে। সংসার জীবনের রূঢ় বাস্তবতা গ্রাস ও আচ্ছাদনের জন্য কাজ নিলে ওয়াইল্ড বোরস জুনিয়র টিমে। সহকারী ফুটবল কোচ রূপে। থাম লুয়াং মাঠে খেলতে গিয়ে ১২ জন কিশোর ফুটবলার সহ নিজে ২ মাইল দীর্ঘ গুহায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে জলমগ্ন হয়ে আটকে পড়লে। সামনে একগলা জল, তারই পাশে পাথরের উপরে টানা ন'দিন ন'রাত। দিনক্ষণের হিসেবের বাইরে অদ্ভুদ এক অন্ধকার জগৎ। বাস্তববাদী তুমি তাই বাইরের সাহায্যের আশা না করে গুহায় খোড়াখুড়ি করে বাইরে আসার প্রচেষ্টা চালিয়েছ। এই ন দিন পাথর থেকে চুঁইয়ে পড়া জলটুকুই ছিল সম্বল। ক্ষুদার্ত ছেলেদের শান্ত রেখেছো ধ্যান করিয়ে। ভিতর থেকে শক্তি দিয়ে বাইরের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে শিখিয়েছ। এ সবই তোমার ১২ বছর সন্ন্যাসজীবন থেকে পাওয়া অভ্যাসের ফল। ন'দিন পরে তোমাদের সঙ্গে যোগযোগ হল। খাদ্য, পানীয়, বাঁচার অক্সিজেন পেলে। কি আশ্চর্য! নিজের ভাগের খাবারটা পর্যন্ত তুমি ছেলেদের ভাগ করে দিলে। গুহার ভিতর থেকে বার্তা দিলে 'আমি ছেলেদের যথাসাধ্য দেখবো।' তোমার এই অভয়বাণী উজ্জীবিত করেছে অভিভাবকদের। বিশ্বজোড়া উদ্ধারের তোড়জোড় চলল। এই মানবিক উদ্ধার কার্য বহু দেশের দক্ষ মানুষের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ কৌশলে সফল হল। একে একে উদ্ধার হল সবাই; সবশেষে তুমি সবচেয়ে ক্ষীণ অবস্থায়। নিজের জীবনের সব ভালোবাসা দিয়ে ছেলেদের দেওয়া কথা রাখলে তাদের কিছু না হতে দিয়ে। কি ভয়ঙ্কর স্নায়ু যুদ্ধে জিতে ফিরলে তুমি ও তোমার টিম 'ওয়াইল্ড বোরস'। তোমাকে ও তোমার ছেলেদের কুর্নিশ। বিশ্বকাপের আসর থেকেও এক বার্তা। খেলোয়াড়রা গোল উৎসর্গ করলেন। কেউ পাঠালেন তাঁদের কষ্ট অর্জিত জাতীয় দলের ঐতিহ্যের জার্সি। আমার মনে হয় তোমার বন্দিদশায় পরনের নীলরঙের জার্সিটাই অনেক অনেক সাহায্য করেছে। এই জার্সির প্রতিটি সুতোয় জমে আছে যে কোন পরিস্থিতিকে জয় করার আত্মবিশ্বাস। আর বৌদ্ধধর্মের উপোসথের গুরুত্ব। উপসথ হল ধর্মময়জীবন গঠনের উত্তম প্রশিক্ষণ কর্ম, যেখানে মানজীবনের যা কর্তব্য ও ব্রত সম্পাদনা করা হয়। তুমি কি তোমার এই জার্সিটা আমাদের দেবে? তুমি আরও একবার শিখিয়ে দিয়ে গেলে জীবনকে উন্নত করতে গেলে ধ্যান ও সংযমের কোন বিকল্প নেই। আজকের এই অস্থির সমাজে যা সবচেয়ে প্রয়োজন। তুমি ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। তোমার জীবন আরও আলোকিত হোক।

অনুভব বেরা, পূর্ব মেদিনীপুর

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়